শ্রমিকশ্রেণী এখন : একটি প্রস্তাব

শ্রমিক শ্রেণীর একটা অংশ, যাদের ডাকা হচ্ছে 'পরিযায়ী শ্রমিক' বলে, তাদের একদিনের মধ্যেই কারখানা থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হলো কোনো মজুরি না দিয়ে, ভাড়া বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হলো। তারা বাড়ি ফেরার পথ ধরলেন বাধ্য হয়ে। রাস্তায় আটকে দেওয়া হলো। ঠিকঠাক থাকার জায়গা নেই, শৌচাগার নেই, খাবার জল নেই, খাবার নেই। এই সময়ে জীবন যাপনের যে নিয়ম সরকার জারি করেছে, এদের বেলায় তা চালু নেই। প্রতিবাদ জানালে পুলিশের আক্রমণ। ট্রেনে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যখন ঠিক হলো, তখন টিকিটের দাম নেওয়া হলো তাদের কাছ থেকেই।

তারা যখন বাড়ি ফিরছেন, তাদেরকে চাইছে না যেখানে ফিরছেন সেই রাজ্যের সরকার, সাবধানী মানুষজন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা করোনা নিয়ে আসছেন।

তাদের কেউ চাইছে না। তারা যেখান থেকে গেছেন সেইখান, না তারা যেখানে গেছেন সেইখান। তারা তো শখ করে যাননি, রোজগার করতে বাধ্য হয়ে গেছেন। কোনো খারাপ কাজে যাননি, উৎপাদনে গেছেন। মালিকদের মুনাফা বানাতে গেছেন। নিজেদের মজুরি আয় করতে গেছেন।

এখন করোনা নিয়ে যা যা হচ্ছে তার কোনও কিছুর জন্যই শ্রমিক শ্রেণী দায়ি নয়। অথচ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তাদের এই হাল বাধিয়ে দেওয়া হলো।

যারা বানালো, কারখানার মালিক, বাড়িওয়ালা, তারা রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানলো না, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানলো না, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষের কথা মানলো না, সবাই দিব্যি পার পেয়ে গেলো। শ্রেণীতে ভাগ হয়ে থাকা এই সমাজে এমনটাই হবার কথা।

আমরা কি করলাম? আমরা 'দাবিপত্র' পাঠালাম সরকারের কাছে, এই শ্রমিকদের, মাঝপথে আটকে থাকা শ্রমিকদের 'ত্রাণ' দিতে – ঠিকঠাক থাকার জায়গা, খাবার দেওয়া আর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা। কোনো কোনো সংগঠন দাবি করেছেন এদের এমন অবস্থার জন্য যারা দায়ি, সেই মালিকদের বাধ্য করা এদের মজুরি দিতে। বেশ, ঠিক আছে! যদিও দেওয়া হয়নি, হবেও না। এরা যে যার জায়গা, যেখান থেকে গিয়েছিলেন, সেখানে ফিরে এসে কি করবেন? এ বিষয়ে খুব একটা শোনা যাচ্ছে না।

যতদূর শুনছি, যারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের জায়গায় ফিরে আসতে পেরেছেন, তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে, যার সরকারি নাম 'কোয়ারেন্টাইন', 'আইসোলেশন ক্যাম্প'। সেখানেও কোনোরকমে থাকা। শান্তিপুরের কারিকর পাড়ার বন্ধুরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এমন ক্যাম্প চালাচ্ছেন। কাছের মানুষজন টাকা জোগাচ্ছেন। সেখানে ক'দিন থেকে ওরা বেরিয়ে আসবেন। তারপর?

এই 'তারপর'টা খুবই অনিশ্চিত। ভবিষ্যতের অর্থনীতি শুধু আমাদের দেশের নয়, সারা পৃথিবীতে অনিশ্চিত। ভয় পাবার মতো। এই শ্রমিকরা যে যে কারখানায় কাজ করতেন, সেই সেই কারখানা আর খুলবে কিনা জানা নেই, সেই কারখানাগুলিতে যা উৎপাদন হতো তার চাহিদা আর বাজার থাকবে কি না জানা নেই। যারা চাহিদা তৈরি করতো তাদের আয় আগের মতো বা আদৌ থাকবে কি না জানা নেই। আয় নেই বলে চাহিদা নেই, চাহিদা নেই বলে উৎপাদন নেই, উৎপাদন নেই বলে শ্রমনিয়োগ

নেই, শ্রম নিয়োগ নেই বলে আয় নেই, এই চক্করে পড়ে যাবে শিল্প অর্থনীতি। পুঁজি মালিকরা কারখানা খুলবে না, শ্রমিক নিয়োগ করবে না।

তাহলে?

এই 'তাহলে'র উত্তর খুঁজতে হবে সবাই মিলে। একটা উত্তর, যেখানে শ্রমিকরা এসে পৌঁছলেন, তাদের এলাকায় সেখানকার কোনো কাজে যোগ দেওয়া। আর কিছু না হোক, মাথার ওপর একটা ছাদ আছে, দুবেলা দুমুঠো খাবার ভাগ করে জুটে যাওয়া, যেভাবেই হোক।

আর একটা 'উত্তর' আমরা বোধহয় বানাতে পারি। পশ্চিমবাংলার উদাহরণ ধরে নিয়ে। পশ্চিমবাংলার নানা জায়গায় নানা ধরণের কারখানা বন্ধ হয়ে আছে, নানা পর্যায়ে, নানা কারণে।

আমরা ভাবতে পারি সেগুলো খোলা যায় কি না। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে 'নাগরিক মঞ্চ'-এর উদ্যোগে চারটে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে, নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় 'শ্রমিক সমবায়'-এর মাধ্যমে বন্ধ কারখানা খোলার প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছিল । অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শিল্পমন্ত্রীর সাথে দেখা করা হয়েছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে। শিল্পমন্ত্রীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। উনি রাজি হননি প্রস্তাবগুলো কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ দিতে।

সেই সুযোগটা আবার চাইতে হবে। বন্ধ কারখানা খোলা শ্রমিক সমবায়ে সরকারি মদতে।

এই বিষয়টা নিয়ে সবচাইতে ভালো বলতে পারবে আমার বন্ধু নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক নব, নব দত্ত। নব লিখলে খুব ভালো হয়। কারা কারা থাকবেন এই উদ্যোগে? বন্ধ কারখানার আগের শ্রমিকরা যারা এখনও কাজ করতে চান, যে শ্রমিকরা অন্য জায়গা থেকে চলে এলেন তারা, পাশে থাকবেন পশ্চিমবাংলায় থাকা প্রযুক্তিবিদরা, যন্ত্রবিদরা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট, এমন সব বিষয়ের মানুষজন। সবটা এখন আর মনে নেই। নাগরিক মঞ্চের তরফে প্রকল্প প্রস্তাব বানাবার সময় এমন অনেককে পাশে পাওয়া গিয়েছিল। প্রস্তাবগুলো নাগরিক মঞ্চের মহাফেজখানায় আছে। এবারও তেমন তেমন মানুষজনকে পাশে পাওয়া যাবে। এমন মানুষজন এখনও পশ্চিমবাংলায় আছেন। সবচেয়ে বেশি দরকার সরকারকে পাওয়া।

সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে কারখানা খোলার। সরকারকে বলতে হবে সেই ক্ষমতা কাজে লাগাতে। বন্ধ কারখানা খুলে দিতে। খুলে দেখতে কারখানার কি অবস্থা। কোন কোন যন্ত্র ঠিক আছে, কোন কোন যন্ত্র একটু মেরামত করে নিলে কাজে লাগানো যাবে। কোন কোন যন্ত্র সারাতে হবে, বদলাতে হবে।

একটা সময় একটা সমীক্ষার কাজে অনেকদিন ধরে, অনেক ক'টি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সাথে কথা বলেছি। কারখানা, উৎপাদন, যন্ত্র, কাঁচামাল, শ্রম নিয়োগ, মালিক, এই সব নিয়ে। এটুকু বুঝেছি শ্রমিকরা সব জানেন, বোঝেন, কারখানার প্রথম থেকে শেষ অব্দি সমস্ত স্তর। আমাকে এই সুযোগটা করে দিয়েছিল আমার বন্ধু শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী কুশল দেবনাথ। শ্রমিকদের এই জ্ঞানকে, দক্ষতাকে, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। এ এক মূল্যবান সম্পদ। অবহেলায় ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই দুঃসময়ে তাকে কাজে লাগানো হোক। এই জায়গাটি হোক আগের কাজের জায়গা থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের নতুন কাজের জায়গা।

আর একটা জরুরি কাজের কথা বলার, যা এই সময়ে ঘটলো, ঘটছে। শ্রমিকদের কারখানা থেকে, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত, সংবাদমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন, যেখানে মধবিত্তের অবস্থান, তারা শ্রমিক বিষয়ে জানতে পারছেন।

মতামত দিচ্ছেন, লিখছেন, সহায়তা করছেন। এই অবস্থাটা কাজে লাগাতে হবে। মধ্যবিত্তের কাছ থেকে একটা মদত পাওয়া যাবে হয়তো। সরকারকে বলার জন্য। যা আগে পাওয়া যায় নি।

আর এই প্রকল্পে নিম্ন মধ্যবিত্তদের জড়িয়ে নেওয়া যাবে অর্থনৈতিক ভাবে। এই ভাবে। নিম্ন মধ্যবিত্তের আয় কমবে। তাদের দরকারি কিছু কিছু জিনিসের চাহিদা হঠাৎ করে কমিয়ে দেওয়া যাবে না। তাদের দরকারি জিনিস যতটা পারা যায় কম দামে এই সব কারখানাতে তৈরি করা যাবে।

একটা সময়ে 'হকার অর্থনীতি' বলে একটা ধারণা বানানো হয়েছিল। গরীব উৎপাদক, গরীব বিক্রেতা, গরীব ক্রেতার মধ্যে চাহিদা-উৎপাদন-যোগানের যোগাযোগ বানানো। ছোটো উৎপাদক কম দামে বানিয়ে ছোটো বিক্রেতাকে দেবে, ছোটো বিক্রেতা কম দামে ছোটো ক্রেতাকে দেবে। এই ধারণাটাকেই বন্ধ কারখানা খুলে উৎপাদন করার ধারণায় ধরা যাবে।

এর সাথে মিলিয়ে আর একটা কথা খুব জরুরি। বন্ধ কারখানা চালু হলে, শিল্পাঞ্চল, শ্রমিক এলাকা বেঁচে উঠবে।

শিল্পাঞ্চল নিয়ে যাদের দেখা বোঝা আছে তারা জানেন চালু শিল্পাঞ্চলের নিজের একটা অর্থনীতি থাকে। বাজার, হাট, মুদিখানা, দোকানপাট, কাপড়ের দোকান, চায়ের দোকান, ছোটো খাবারের দোকান, ইস্কুল, সিনেমা হল, আরও এমন সব কিছু। বসিয়ে দেওয়া শ্রমিক আর ফিরে আসা শ্রমিকদের দিয়ে 'আর একটা অর্থনীতি' বেঁচে উঠবে। ছোটো আয়, ছোটো ব্যয়, ছোটো কেনাবেচা দিয়ে একটা ছোটো অর্থনীতি আবার বেঁচে উঠবে।

এবার বিষয়টাকে অন্য একটা ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল, সামাজিক ভূগোল -এ নিয়ে গিয়ে দেখাবো। আমার বন্ধু সৌমিত্র, উত্তর বাংলায় বনবাসী অধিকার নিয়ে কাজ করে। ওর সাথে কথা হচ্ছিল। উত্তর বাংলা জঙ্গল এলাকা থেকে যে শ্রমিকরা বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে এসেছেন, আসছেন।

বনবাসী আন্দোলন কর্মীরা এই শ্রমিকদের এখনকার কাজের জায়গা হিসেবে ভাবছেন এলাকার জমি, জঙ্গল, জলভিত্তিক উৎপাদনের কথা। তাদের শ্রম নিয়োগের এমন সব জায়গার কথা।

কথায় কথায় চলে আসে কথারা। আমি তখন রাজাভাতখাওয়ায় বনবাসী অধিকার কাজে। আন্দোলনের কর্মী লাল সিং ভুজেলের সঙ্গে আড্ডা হচ্ছিল একদিন। লালসিংকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম জঙ্গল থেকে কতরকমের রসদ পাওয়া যায় যা তোমাদের নানা কাজে লাগে, লাগতে পারে। লালসিং একদিন সময় চেয়ে নিয়ে পরের দিন প্রায় ৬০টি উপাদানের নাম দিয়েছিল। এখন সেই উপাদান ভিত্তিক উৎপাদনের কথা ভাবা হচ্ছে, যে কাজে যোগ দেবেন ফিরে আসা শ্রমিকরা।

প্রায় কাছাকাছি এমন কথা লিখেছিলাম আমার সবে লেখা একটি রচনায় 'নিচের দিকের অর্থনীতি', শান্তিপুরের বন্ধুদের প্রশ্নের 'হতে পারে' উত্তর হিসেবে।

ছোটো একটা উদাহরণ দিই। বহরমপুরে ত্রাণের কাজ করছে আমার বন্ধু কৃষ্ণজিৎরা। ওরাও আস্তে আস্তে 'খাবার জন্য ত্রাণ' থেকে 'আয়ের জন্য ত্রাণে' সরে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ ছিল, মাছ ধরার জাল কিনে দেওয়া। সে এখন নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করে আয় করছে, খাবার ত্রাণ নিচ্ছেনা।

এমন একটা উদ্যোগে সব চেয়ে বড়ো দরকার রাজ্য সরকারের মদত। মদত চাইলেই সরকার দেবে তা তো নয়। আগেই বলেছি বামফ্রন্ট সরকার দেয় নি। এই সরকারকে বোঝাতে হবে সমাজের সব স্তর থেকে। শ্রমিক, কৃষক, গ্রামবাসী, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, হকার, ছোটো দোকানদার, সাংবাদিক, ছোটো ব্যবসাদার, ছোটো পত্রিকা, পরিবহন কর্মী, স্কুল শিক্ষক, অধিকার আন্দোলন কর্মী,

রাজনীতিক কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, শহরের দরিদ্র শ্রমিক বিষয়ে উৎসাহী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, স্বাস্থ্যকর্মী, এমন সব জায়গা থেকে সরকারকে অনুরোধ করতে হবে। যদি হয়, তাহলে পশ্চিমবাংলা একটা উদাহরণ হয়ে উঠবে।

এই প্রস্তাব রচনাটি একটি প্রথমিক খসড়া। সবার আলোচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, কাজে লাগানো যাবে। বন্ধুদেরকে পাঠালাম, আশা রাখছি মতামতের মধ্যে দিয়ে কথাগুলো এগিয়ে যাবে। বাস্তবে প্রাণ পাবে। বাইরে কাজ করতে গিয়ে অপমানে ফিরে আসা শ্রমিকরা, বন্ধ করে ফেলে রাখা কারখানার শ্রমিকরা 'শ্রমিক শ্রেণী' হয়ে উঠবে।

এবিষয়ে আর একটা কথা।
'পরিযায়ী শ্রমিক' বা 'অভিবাসী' শ্রমিক বলে কিছু হয়না।

সব শ্রমিকই 'পরিযায়ী' শ্রমের শুরু থেকেই। সে চা বাগানের শ্রমিক হোক, নির্মাণ শ্রমিক হোক, কারখানার শ্রমিক হোক, ইঁটভাটার শ্রমিক হোক, বাগিচা শ্রমিক হোক, শহর শ্রমিক হোক, সব শ্রমিকেরই শুরু গ্রাম থেকে, কৃষি থেকে, প্রকৃতিনির্ভর উৎপাদন থেকে।

এই কথাটা খেয়াল রাখা দরকার যে সব শ্রমিকই আসলে 'শ্রমিক শ্রেণী'র অংশ। এখন 'শ্রমিক' বর্গটার আগে কিছু একটা বসিয়ে দিলে পুঁজি মালিকেরই লাভ, শ্রমিকের ক্ষতি। তাই এখন 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক', 'অস্থায়ী শ্রমিক', 'কন্ট্রাক্টরের শ্রমিক', 'চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক' ইত্যাদি। একই কারখানার একই কাজে থাকা শ্রমিকদের নানা নামে ডাকা।

তেমনই 'পরিযায়ী' শ্রমিক।

কেন 'শ্রমিক', 'ওয়ার্কার' না বলে অন্য অন্য নামে ডাকা?

ঐতিহাসিক ভাবে সময়কাল ধরে নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকরা নানা 'অধিকার' অর্জন করেছিলেন। আইনী অধিকার, আর্থনীতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, সাংগঠনিক অধিকার, লিখিত অধিকার, সরকার ও পুঁজিমালিক স্বীকৃত অধিকার। এখন সেই 'অধিকার' কেড়ে নেবার পালা চলছে। 'শ্রমিক' বর্গের আগে নানা 'নাম' বসিয়ে দিয়ে অধিকার কেড়ে নেওয়া। যার এই এখনকার উদাহরণ 'পরিযায়ী' নাম বসিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের একদিনে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। কারখানা মালিক, রাজ্য, কেন্দ্র সরকার, রাষ্ট্র, লোকসভা কারোর কোনো দায় না নেওয়া।

নাগরিক মঞ্চ থেকে আমরা এলা ভাট শ্রম কমিশনের কাছে একটা প্রতিবেদন জমা দিয়ে বক্তব্য রেখেছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে। আমরা তখন একটা তালিকা বানিয়েছিলাম 'শ্রমিক শ্রেণী'কে নানা নামে নানা ভাগে ভাগ করার। দেখিয়েছিলাম কি ভাবে এই ভাগ বানানোর সাথে সাথে শ্রমিকদের অধিকার, পাওনা, বাদ দিতে দিতে যাওয়া।

সেই ভাগ বানানো এখনও চলছে, অধিকার, পাওনা,সুযোগ সুবিধা কেটে নেওয়া এখনও চলছে।

এর সামনে দাঁড়িয়ে এই এবারেও শ্রমিক সংগঠনদের লেখাতে শ্রমিক-এর আগে 'পরিযায়ী' শব্দটা বসতে দেখলাম। আর কোথাও 'শ্রমিক শ্রেণী' কথাটা দেখলাম না।
হয়তো আমি ঠিক দেখিনি!

শুভেন্দু দাশগুপ্ত
১৩ জুন, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com